যুগান্তর

তারিখ 2 8 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এ কে এম শাহনাওয়াজ

পরীক্ষার অক্টোপাস থেকে শিশুদের রক্ষা করবে কে?

সদ্য শেষ হল ছোট শিশুদের পাবলিক পরীক্ষা। একে বলে পিইসি পরীক্ষা। ক্লাস ফাইভের সমাপনী পরীক্ষা। তবে আমাদের যুগের মতো সাদামাটা ম্যাড়মেড়ে অতি সাধারণ পরীক্ষা নয়। এটি এক অসাধারণ পরীক্ষা। এসএসসির মতোই একটি পাবলিক পরীক্ষা। এমন পাবলিক পরীক্ষার অর্থটি এই শিশুরা বুঝে কতটুকু গর্বিত হয় জানি না, তবে আমার কাছে একে মনে হয় আইয়ুব খানের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের মতো। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাতপুরুনো চেয়ারম্যান নন— ইউনিয়ন বোর্ডের সম্মানিত 'প্রেসিডেন্ট' করে তাদের সম্মান যেন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিন্দুকরা শুধু বলবে, 'আসলে 'যেই লাউ সেই কদু।' কিন্তু অমন বেরসিক মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারব না। যে আয়োজন স্কুল আর পরিবার পিইসি পরীক্ষার্থীকে ঘিরে করে থাকে, তেমন সম্মানের সিকিভাগও আমরা ক্লাস ফাইভের সমাপনী পরীক্ষার সময় পাইনি।

এখন তো শিশু ক্লাস ফাইভে উঠলে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করেন বিভিন্ন আয়ের অভিভাবক। পিইসির ফলাফলের ব্যবহারিক বিশেষ মূল্য না থাকলেও সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্য আছে। অমুকের ছেলে বা তমুকের মেয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে তাই আমার মেয়েটি না পেলে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। শিশুটি হয়তো বাবা বা মায়ের মুখে এসব শোনে— কিন্তু গূঢ়ার্থ না বুঝে ফ্যালফেল করে তাকিয়ে থাকে। স্মার্ট কোচিং ব্যবসায়ীরা দেরি করেনি। খুলে বসেছে পিইসি কোচিং সেন্টার। গাইড বণিকরা তো আরও ঘুঘু। নানা মলাটের 'শিওর সাকসেস' টাইপের গাইড বই বের করে ফেলেছে। পকেট ফাঁকা হচ্ছে লক্ষ অভিভাবকের।

১৯ নভেম্বর পিইসি পরীক্ষার সময় স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া নিচ্ছিলেন টিভি সাংবাদিক। এক মা জানালেন, পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে তার ছেলেটিকে দিনে-রাতে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত পড়িয়েছেন। ছেলে যদি এ-প্লাস না পায়, তবে তার দুঃখের অন্ত থাকবে না। এক বাবা ক্ষোভে কাঁপছেন। যে সার্টিফিকেটের ব্যবহারিক মূল্য নেই, তার জন্য শিশুকে এত কষ্ট দেয়া কেন! পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসে এক ছাত্র সর্বাঙ্গে ক্লান্তি নিয়ে বলছে, 'এত পড়তে ভালো লাগে না।' আরেক শিশুকন্যা এক মুখ হাসি নিয়ে বলছে, 'ইনশাআল্লাহ এ-প্লাস পাব।' ব্যাংকের ক্যাশিয়ার আমার এক প্রতিবেশীর মেয়ে আর ছোট ভাই একসঙ্গে পিইসি পরীক্ষা দিচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যারা এই পরীক্ষাগুলোর আমদানি করেছে তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোচিং আর গাইডওয়ালাদের তলে তলে যোগাযোগ আছে।' প্রসঙ্গ নাজুক দিকে চলে যাচ্ছে ভেবে আমি দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম।

তবে একই দিনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে তার অস্বস্তির কথাও জানালেন। বললেন, এ সার্টিফিকেটের কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই, তাই এ পরীক্ষা নেয়ার তাৎপর্য তার কাছেও স্পষ্ট নয়। সরকার— বিশেষ করে কেবিনেট থেকে বন্ধের সিদ্ধান্ত হলেই তিনি এ পরীক্ষা বন্ধ করতে পারবেন। শুনে আমি বিনা কারণেই চমকে গেলাম। আমার এক ঝলক সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার কথা মনে হল। রাজাই সিদ্ধান্ত নেন পাঠশালা চলবে কী চলবে না। শিক্ষার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যুক্ত শিক্ষকের কিছু বলার কোনো মূল্য নেই। শিক্ষাবিদ নন, সর্বজ্ঞানে প্রজ্ঞাবান আমলা-মেধা থেকে পিইসি নাজিল হয়েছিল। সুতরাং তা বহাল থাকবে কী থাকবে না, তা নির্ধারণের এখতিয়ার তো তাদেরই থাকবে। লাখ লাখ অভিভাবক আর গিনিপিগ শিক্ষার্থীরাও এদেরই খেয়ালখুশিমতো চলতে বাধ্য। কথাটি বলার কারণ আছে। অনেকদিন আগের কথা, যখন জেএসসি ও পিইসি নামের দুটো পাবলিক পরীক্ষা চালু হয়েছে শুনে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। প্রায় ৩৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই আমার মধ্যে এ বিরক্তির জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলেও শিশুশিক্ষার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। ১৯৯৬ সাল থেকে মাঝে মাঝেই এনসিটিবি ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপেন স্কুলের কারিকুলাম তৈরি ও পুস্তক প্রণয়নের সঙ্গে আমার যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি বরাবর যেখানে পরীক্ষার অক্টোপাস থেকে যতটা পারা যায় শিশু শিক্ষার্থীদের মুক্ত করায় বিশ্বাসী, সেখানে এমন পরীক্ষার অত্যাচার আমার কাছে খুব অবৈজ্ঞানিক মনে হতে লাগল। সে সময় একজন স্বনামধন্য বিদগ্ধ অধ্যাপকের সাফাই বক্তব্য পত্রিকায় পড়েছিলাম। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কমিটির সদস্য তিনি ছিলেন। বললেন, 'আমরা তো শুধু জেএসসি পরীক্ষা নেয়ার সুপারিশ করেছিলাম। পিইসি পরীক্ষার কথা বলিনি।' দু'দিন পর এ রহস্য উন্মোচিত হল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত এক বড় আমলা টেলিভিশন টকশোতে বেশ গর্বের সঙ্গেই জানালেন, পিইসি তার নিজস্ব জ্ঞানপ্রসূত সিদ্ধান্ত। কারণ হিসেবে বললেন, শিশুদের এমন একটি পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে শিক্ষকরা স্কুলে পড়ানোর ক্ষেত্রে আরও মনোযোগী হবেন। বুঝলাম শিক্ষকদের টাইট দেয়ার জন্য নিজ ক্ষমতাবলে একটি বড় যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তিনি। এখন আমাদের দেশ হয়ে গেছে এমন যে, চোখের ডাক্তারও চান্স পেলে হার্টের অপারেশন করেন।

লন্ডন প্রবাসী আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ৬ বছরের মেয়েটি স্কুলে পড়ে। জানাল, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলেই প্রতিদিনের পড়াশোনা সেরে আসতে হয়। বাসায় পড়াশোনার তেমন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া স্কুলের পড়াও চার দেয়ালে আটকে থাকা সিলেবাস আবদ্ধ পড়াশোনা নয়। সপ্তাহে হয়তো একটি দিনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যায় পাহাড়, ঝরনা, নদী বা সমুদ্রের কাছে। প্রকৃতি থেকেই ওরা অনেক কিছু শেখে। পরীক্ষাতঙ্কে ভুগতে হয় না বলে ওদের মেধা বিকাশের শুরুতে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটার সহায়ক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে শিক্ষাকে আধুনিক ও লাগসই করার জন্য আমাদের তো গবেষণার অন্ত নেই। আর সেই গবেষণার ফসল হিসেবে শিশুশিক্ষার্থী থেকে শুরু করে স্কুলের উচ্চপর্যায় পর্যন্ত চালু হয়ে গেল সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি। এটি কার্যকর করার সূচনাস্থলে আমার থাকার সুযোগ হয়েছিল। সম্ভবত ২০১১ সালের কথা। এনসিটিবিতে নতুন শিক্ষানীতির আলোকে নতুনভাবে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম তৈরি ও বই লিখতে হবে। প্রথমে সরল ধারণা ছিল। সৃজনশীল বলতে শ্রেণীকক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাবেন কাছের নদীর তীরে অথবা ফুটবল খেলার মাঠে। শিক্ষার্থীরা যা দেখে এসেছে শিক্ষকের নির্দেশনামতো লিখে তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাবে; কিন্তু পরে তা পাল্টে গেল। বিদেশ থেকে নানা কিছু আমদানি করতে আমাদের ভালো লাগে। শেষ পর্যন্ত নদী আর ফুটবল খেলা দেখা হল না, ইমপোর্টেড সৃজনশীল পদ্ধতি আরোপিত হল। দুর্বল মেধার কারণে আমি এর অনেক কিছু বুঝতে পারিনি। এখনও বুঝতে পারছি না এ দিয়ে কী সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো হয়েছে। যে প্রশিক্ষণ হয়েছে তাতে সিকিভাগ শিক্ষকও দক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি। প্রত্যাশা ছিল সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে পুঁথিগত এবং মুখস্থবিদ্যা থেকে বের করে আনা হবে শিক্ষার্থীদের। কিন্তু বাস্তবে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ায় শিশু শিক্ষার্থীর কাছেও চলে এসেছে সৃজনশীলের গাইড বই। এসব গাইড পুস্তক দেখেই অনেক স্কুলে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন তৈরি হয়। শিক্ষার্থী উত্তর লেখে গাইড বই মুখস্থ করে। এভাবেই আমাদের উদ্ভাবনী মেধার অধিকারীরা চৌকস মেধাবী করে তুলছেন আগামী প্রজন্মকে।

যেসব গবেষক নীতি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দু'দিন পরপর শিক্ষাকে আধুনিক করতে গিয়ে শিশুদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছেন, তাদের কাছে বিনীত নিবেদন— আপনারা কি দয়া করে এসব 'আধুনিক' পরীক্ষার ফলাফল জানাবেন? সৃজনশীল পাঠের যুগে পিইসি-জেএসসি পরীক্ষা উতরিয়ে এ প্রজন্ম কতটা অতিরিক্ত সৃজনশীল মেধার অধিকারী হল? এ ধারার প্রজন্মকে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাইনি। হয়তো কয়েক বছর পর পেয়ে যাব; কিন্তু এর আগে সনাতনী পাঠ বাদ দিয়ে বৃন্ত ভরাটের যুগে প্রবেশ করানো হয়েছিল। এ দুর্ভাগা মেধাবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পেয়েছি। দেখেছি 'এ' আর 'স্বর্ণখচিত 'এ' পাওয়া মেধাবীদের বড় অংশের জানার জগৎটিকে কতটা সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। গণ্ডির বাইরে ওদের অনেকেই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়।